ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
উনত্রিংশত্তম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৩/অগ্রহায়ণ ১৪১০

সাহায্য নামের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতি মুক্তির উপায় কি ?

মোঃ আবুল হোসেন *

Abstract: *For Bangladesh foreign aid is considered a decisive government policy tool which the successive Bangladeshi government has been using in shaping the economy and development. It is interesting to note that after 35 years of independence, the successive government took millions of dollars as foreign aid, little development has taken place. A broad review of the literature on development suggests that foreign aid-played very little role in promoting economic development and improving human welfare. Rather the abundance of foreign aid has created a culture of dependency, polarized the society, destroyed nation's creativity and demolished the image of nation state. The paper argues that we need to recapture our self-respect and self-image. For that matter, there is a need for a campaign against the danger of foreign aid. Foreign aid and social well-being of the mass population are not synonimous we have to understand this reality.*

বৈদেশিক সাহায্য কি ?

সাহায্য হলো বিশেষ সুবিধা প্রদান সাপেক্ষে এক দেশ থেকে অপর দেশে সম্পদ হস্তান্তর। ব্যাপক অর্থে বৈদেশিক সাহায্য বলতে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থসম্পদ ও কারিগরী সহায়তাকে বুঝায়। বিশ্ব পুঁজি বাজারে প্রচলিত ঋণদান ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে দাতাদেশ কর্তৃক গ্রহীতা দেশে সম্পদ হস্তান্তরকেই বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়ে থাকে ।

বৈদেশিক সাহায্যের প্রকারভেদ

বৈদেশিক সাহায্যকে বিশেজ্ঞগণ তিনটি পর্যায়ে বিভাজন করে থাকেন। পর্যায় তিনটি হলো, (ক) খাদ্য সাহায্য (খ) দ্রব্য সাহায্য (গ) প্রকল্প সাহায্য (সারণি -১ দ্রষ্টব্য)। সাহায্য বিভিন্নরূপে আসে । কোন সময় প্রত্যক্ষ মূলধন আকারে, কোন সময় প্রযুক্তির আকারে, আবার কোন সময় ব্যবস্থাপনা ও উপদেশ আকারে। সাহায্যের শর্ত অনুসারে বৈদেশিক সাহায্য শর্তযুক্ত কিংবা শর্তহীন হতে পারে। আর সাহায্যের ব্যবহার অনুসারে একে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য এবং বাণিজ্যিক দান হিসাবে একে দান ও ধার বলা হয়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সারণি -১
বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক সাহায্য ও তাদের সম্পর্ক

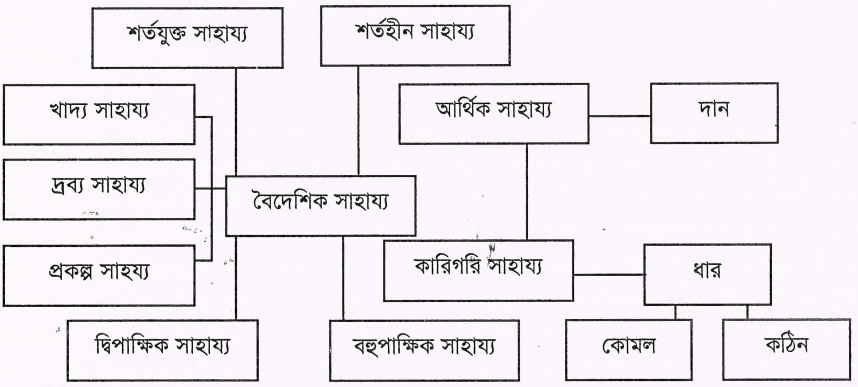

উৎস: মুহাম্মদ সেলিম আকন্দ (২০০১) সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, গুরুগৃহ প্রকাশনী।

বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য

বিদেশী সাহায্য আসে মূলত পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশ ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে পাশ্চাত্যের উনিশটি দেশ নিয়ে গঠিত ওইসিডি। এরপরে ওপেকভুক্ত দেশগুলো। আর ঠাণ্ডা লড়াইকালীন সময়ে তৃতীয় স্থানে ছিলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো; এছাড়াও বিভিন্ন আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশ্ন হলো দাতা দেশ বা সংস্থাগুলোর সাহায্য প্রদান কি নির্মোহ? নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে এর উত্তর নেতিবাচক দাতাদের সাহায্য প্রদানের অন্তর্নিহিত কারণগুলো থেকে এ ধারণার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ মূলত তিনটি: প্রথমতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থ, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্যই যে মানবিক কারণে দেয়া হয় না তাতে কোনো সংশয় নেই। বৈদেশিক সাহায্য দেয়ার সময় দাতাদেশ গ্রহীতা দেশের উপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে এবং দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডীর বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। সাহায্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, Foreign aid is a method by which the United States maintains a policy of influence and controls around the world and sustains a good number of countries which would definitely collages or go into the communist block (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)

সারণি -১
বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক সাহায্য ও তাদের সম্পর্ক

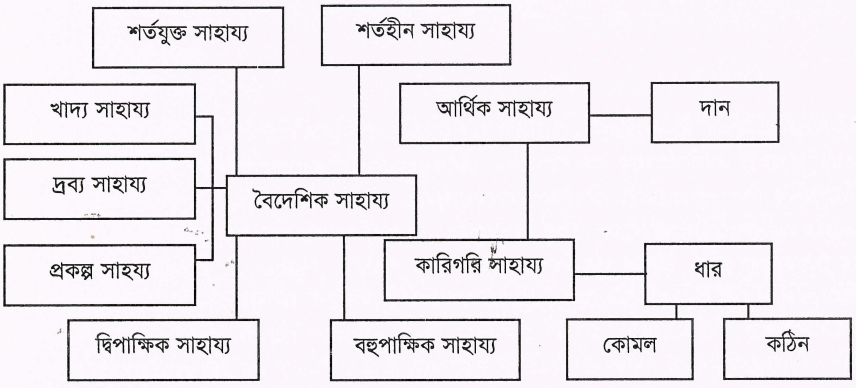

উৎস: মুহাম্মদ সেলিম আকন্দ (২০০১) সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, গুরুগৃহ প্রকাশনী।

বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য

বিদেশী সাহায্য আসে মূলত পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশ ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে পাশ্চাত্যের উনিশটি দেশ নিয়ে গঠিত ওইসিডি। এরপরে ওপেকভুক্ত দেশগুলো। আর ঠাণ্ডা লড়াইকালীন সময়ে তৃতীয় স্থানে ছিলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো; এছাড়াও বিভিন্ন আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশ্ন হলো দাতা দেশ বা সংস্থাগুলোর সাহায্য প্রদান কি নির্মোহ? নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে এর উত্তর নেতিবাচক দাতাদের সাহায্য প্রদানের অন্তর্নিহিত কারণগুলো থেকে এ ধারণার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ মূলত তিনটি: প্রথমতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থ, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্যই যে মানবিক কারণে দেয়া হয় না তাতে কোনো সংশয় নেই। বৈদেশিক সাহায্য দেয়ার সময় দাতাদেশ গ্রহীতা দেশের উপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে এবং দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডীর বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। সাহায্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, Foreign aid is a method by which the United States maintains a policy of influence and controls around the world and sustains a good number of countries which would definitely collages or go into the communist block (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)

সারণি - ২

বৈদেশিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্য

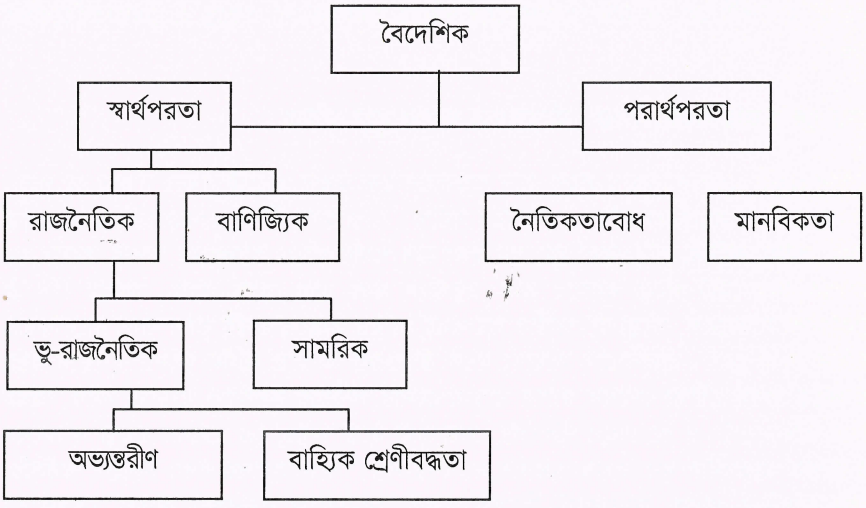

উৎস: মুহাম্মদ সেলিম আকন্দ (২০০১) সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, গুরুগৃহ প্রকাশনী।

বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভরতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা স্বাধীনতা-উত্তর প্রক্রিয়া নয়, যদিও স্বাধীনতা উত্তর কালে অনুসৃত ধারায় তা আরো ব্যাপক ও গভীর রূপ লাভ করেছে এবং যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা।[১] পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোয় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ক্ষেত্রে জাতিগত নিপীড়ন ভিত্তিক বৈষম্যমূলক নীতিমালা কার্যকর ছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শোষণের মাধ্যমে পাকিস্তানের পূর্বাংশ থেকে নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে সম্পদ পাচার হতো যার ফলে দেখা যায় যে, ষাটের দশকের দিকে বাংলাদেশ একটি ঘাটতি অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলাদেশকে আমদানী করতে হতো প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের শতকরা ১২.৭ ভাগ। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিলো শতকরা ৭ ভাগের কিছু ওপরে এবং বৈদেশিক সম্পদ প্রবাহের পরিমাণ ছিলো দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৪.২ ভাগ। এই সময়ে (১৯৬৬-৬৭) ন্যূনতম ১৮০৫ ক্যালরী খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বঞ্চিত দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো এ অঞ্চলের ৪২ শতাংশ জনগণ।[২]

স্বাধীনতার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর সম্পদ দেশে আসে। ফলে বিদেশী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তদানীন্তন নেতৃত্বকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনের প্রয়োজনে আগ্রহের সাথে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিমাণে বিদেশী সাহায্যর সহজপ্রাপ্যতা উন্নয়ন কাজের জন্য আরো অধিক হারে বিদেশী ঋণ নেয়ার আগ্রহকে তীব্র করে তোলে। ফলে বিদেশী ঋণ নির্ভর হয়ে পড়েছে আমাদের উন্নয়ন বাজেট। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বিদেশী সাহায্য আজ উন্নয়নের আদর্শ হিসাবেই পরিগণিত তাদের কাছে বিদেশী সাহায্য ও উন্নয়ন শব্দ দুটি যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এখন সাহায্যদাতা

কনসোর্টিয়াম দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। সাহায্য দাতাদের দ্বারা প্রকল্প ও কর্মসূচি পরীক্ষিত, সংশোধিত এমনকি প্রণীত পর্যন্ত হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ দেশের উন্নয়ন তৎপরতার খবরদারী করে থাকে। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রশ্নে সাহায্যদাতাদের মতামত এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা অধিকতর কার্যকরী হয়, এমনকি বাংলাদেশের দৃষ্টিতে অন্য কোনো প্রকল্পে অগ্রাধিকার বিবেচিত হলেও !

সাহায্য পুষ্ট হাজার হাজার প্রকল্প : আঁতুড়ঘরে যাদের মৃত্যু ঘটেছে

যে কোন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাস্তবায়ন শুরু করার আগেই দফায় দফায় যে প্রাক-সম্ভাব্যতা জরিপ, সম্ভাব্যতা জরিপ, বাস্তবায়ন সমীক্ষা, ডিজাইন সমীক্ষা, প্রকল্পপরিকল্পনা, প্রকল্প সমীক্ষা, প্রকল্প স্ক্রুটিনি, পরিকল্পনা মূল্যায়ন ইত্যাকার পর্যায়ক্রমিক কাজগুলো সম্পর্ন্ন করতে হয় সেগুলোর জন্য মোট প্রকল্প ব্যায়ের এক- চতুর্থাংশ খরচ হয়ে যেতে পারে। আবার যদি ঐ সমীক্ষাগুলো দাতাদেশ, সংস্থা বা গোষ্ঠীর পছন্দসই না হয় তাহলে একই কাজ বারে বারে করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এমনিভাবে সাহায্য যখন কতগুলো কাগুজে দলিল রচনার পেছনে খরচ হতে থাকে তখন গ্রহীতা দেশের ঋণের খাতায় দেনার পরিমাণ সুদাসলে বাড়তে থাকে, অথচ এতসব দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যায়বহুল দলিলের শেষ কথা হতে পারে, 'এ ধরনের প্রকল্প দাতাদের জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয় বিধায় অর্থায়ন সম্ভবপর নয়।' বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, রূপপুর আণবিক প্রকল্প, জয়পুরহাট সিমেন্ট প্রকল্প, জামালগঞ্জ কয়লাখনি প্রকল্প, রেলওয়ের ডবল লাইন প্রকল্প- এগুলো উপর্যুক্ত ধরনের প্রকল্প যেগুলো আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা তার নিশ্চয়তা এখনও নেই। অথচ যে গুলোর সুবাদে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের খাতায় কয়েক'শ কোটি টাকা দেনা লেখা হয়ে গেছে গত চার দশকে। উপরের কয়েকটা বড় বড় প্রকল্পের মত কয়েক হাজার প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্ব অবস্থায় প্রচুর ঋণ ও সাহায্য চেটেপুটে খেয়ে কাগজের স্তুপ হিসাবে নিদ্রামগ্ন রয়েছে দেশের এবং দাতাদের দপ্তরে। প্রফেসর ইউনুস সখেদে বলেছিলেন, বাংলাদেশ হাজার হাজার অসমাপ্ত, পরিত্যক্ত এবং পরিকল্পিত প্রকল্পের কবরস্থান। তার হিসেবের মধ্যে উপরে বর্ণিত 'সম্ভাব্য' অথচ ব্যয় বরাদ্ধ প্রাপ্ত প্রকল্পগুলো ধরলে দেখা যাবে ঐ 'Yet to be born' ক্যাটাগরির কল্পিত (পরিকল্পিত নয়) প্রকল্পের পিছনেই প্রায় সাহায্য খরচ হয়ে থাকে। এভাবে প্রকল্প সাহায্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী দাতারা ফেরত নিয়ে যাওয়ার কাহিনী এখন পুরানো শুনাবে কারণ এগুলোর কারণেই প্রকল্প সাহায্যকে Donor- Sponsor employment service আখ্যায়িত করা হয় রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিভাষায় । আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে গত চব্বিশ বছরে (১৯৭২/৭৩-১৯৯৪/৯৫) মোট ২৭,৬১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহিত হয় এগুলোর মধ্যে (১৯৭২/৭৩-১৯৯৩/৯৪) তেইশ বছরে ২৬,৫১৯টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩,০০০ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয়। শতকরা হিসাবে যার সংখ্যা দাড়ায় ১১.৩১% । উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলোর জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত এই অর্থের মধ্যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৮২ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা । আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহিত এসব প্রকল্পের সফলতার হার খুবই হতাশাব্যঞ্জক।[৩]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রভাব

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে দাতাদের ব্যাপক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ এ দেশে স্বনির্ভরতার বদলে নির্ভরতার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং বিরাজমান দুরবস্থার মূলে পানি সিঞ্চন করছে।[৪] আমাদের দেশ কিভাবে চলবে, এর অবকাঠামো কি হবে, বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট, আমাদানী নীতি, খাদ্যনীতি এমনকি কতোজন শিশু বছরে জন্মগ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের নীতি নির্ধারকগণ টোকিও, বন, ওয়াশিংটন, প্যারিসের ওপর সাগ্রহে নির্ভর

করে থাকে। উন্নত দেশের নীতি নির্ধারকগণ আমাদের দেশের প্রত্যেকটি কর্মসূচি, চিন্তা ভাবনা, ধ্যান-ধারণায় এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে, দু'দশক পূর্বে এ ধরনের অবমাননাকর, ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতিকে কেউ চিন্তার মধ্যেও আনতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ততোদিন পর্যন্ত এই আগ্রাসনের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হবে না যতোদিন না এদেশের রাজনীতিবিদ, আমলা এবং দেশের নীতিনির্ধারকরা তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে পারবেন।[৫]

ঋণের একটি বড় অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে (সামরিক বাহিনী, প্রশাসন, বৈদেশিক মিশন ইত্যাদি) বা সামাজিক উন্নয়ন খাতে (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি। ব্যয় হওয়ার কারণে এসব খাত থেকে কোন প্রকার রাজস্ব আয় না হওয়ায় কেবলমাত্র ঋণের সুদ বা ঋণ পরিশোধ করা দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য দ্বারা অনুন্নত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের কোন উপকার হয় না। এসবের দ্বারা উপকৃত হয় কেবল সামরিক বেসামরিক আমালাবর্গ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমাদানীকারক, রাজনীতিবিদ, গ্রামীণ ভূস্বামী, শহুরে জনগণের সংখ্যালঘু অংশ ইত্যাদি। অথচ বোঝা বহন করতে হয় মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই। দাতাদেশ ও সংস্থাগুলো যে শুধুমাত্র ঋণ সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদী মুনাফার প্রবাহ সমুন্নত রাখে তাই নয় বরং প্রকল্প ও কারিগরী সাহায্য চুক্তির মধ্যে শুভঙ্করী ফাঁক রেখে অনুন্নত দেশগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত্ম করা হয়। এটা করা হয় দাতাদেশ বা সংস্থাগুলোর নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্রকল্প কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বা তাদের বিলাসবহুল বাড়ী-গাড়ী, আহার-বিহারের ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী কর্মকর্তাদের থাকা খাওয়া ও যানবাহনের ভাতা হিসাবে প্রদত্ত অর্থ সাহায্য গ্রহীতা দেশে প্রদান করা হয় আর করমুক্ত বেতনের অর্থ তাদের নিজ নিজ দেশের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয় । এতে গ্রহীতা দেশ ঋণের অর্থে লালিত বিদেশীদের আয়-ব্যয়ের নানা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা (স্থানীয় কর, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি) থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকল্প ও কারিগরী সাহায্যের চেয়েও খাদ্য সাহায্য অনুন্নত দেশগুলোর সাধারণ কৃষি অর্থনীতির ওপর সর্বাধিক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে খাদ্যের আমদানী বৃদ্ধিই যে এই সাহায্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য তা আজ প্রমাণিত সত্য। আর এই সত্যকে সুসংহত করার লক্ষ্যে দাতাদেশ ও সংস্থাগুলো গ্রহীতা দেশের কৃষি নীতি, কৃষি উপকরণ এবং কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ বিষয়ে নানাভাবে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।[৬]

ঋণদাতা দেশগুলো তাদের পণ্যের উন্মুক্ত বাজার চালু ও তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ে রাখার জন্যই মূলত ঋণের অবারিত ভাণ্ডার দরিদ্র দেশ সমূহের দিকে প্রসারিত করে থাকে। ১৯৮৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ সোলজ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'উন্নয়নশীল দেশসমূহে কেবলমাত্র ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৫৮০ বিলিয়ন ইউ. এস ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করেছে যা ঐ সমস্ত দেশে প্রদত্ত সর্ব-প্রকার আর্থিক সহায়তার সতেরো গুন বেশি। জর্জ সোলজ- এর স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির বাইরে ঋণ গ্রহীতা দ্ররিদ্র দেশটি শিল্প বা কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো কিনা, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে কিনা বা সত্যিকারের ন্যায় বিচারভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো চালু হলো কিনা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর কাছে এসব বিষয়গুলো কখনই মুখ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার ও কীটনাশকের সহজলভ্যতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। অথচ ১৯৭৪-৭৫ সনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সারের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপেক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিবর্তিত রপ্তানী

নীতির জন্য বিদেশে সার রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ তৃতীয় বিশ্বের খাদ্যোৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি নির্মম বাস্তবতা হলো এই যে, ঐ একই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গলফ ক্লাব, ঘাসের লন ও কবরস্থানের জন্য প্রায় তিন মিলিয়ন টন সার ব্যবহৃত হয়।

আমরা যাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারি সেজন্য সাহায্যদাতা দেশসমূহ সার কীটনাশকের ওপর ভর্তুকী তুলে নেয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সারের মূল্য হঠাৎ করেই বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয়ারই পদক্ষেপ। অথচ এক হিসাবে দেখা গেছে, সরকার যদি সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয় তাহলে সরকারের সাশ্রয় হবে মাত্র ৬০ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে প্রায় ৩০০ হাজার টন।[৭] আর এই পরিমাণ খাদ্য- ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য শস্য কিনতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার। অনুরূপভাবে প্রকল্প সাহায্য হিসাবে শর্তযুক্ত যে ঋণ দরিদ্র দেশসমূহ পেয়ে থাকে তার বিপরীতে গ্রহীতা দরিদ্র দেশসমূহকে যদি নিঃশর্তে ঋণের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া হয় তাহলে প্রকল্প ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ সাশ্রয় সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে এখানে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর স্থাপিত সেতুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীন সরকার ১০৮.০০ কোটি টাকায় সেতু নির্মাণ করেছে অথচ একই সেতু স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ৩৮.০০ কোটি টাকায় করে দিতে চেয়েছিলো।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য

বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেট ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর হয়ে পড়েছে যদিও রাজস্ব বাজেটের পরনির্ভরশীল চরিত্রটি চট করে ধরা পড়ে না । বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের গড়ে শতকরা ৬৩ ভাগ এর অধিক পরিমাণ অর্থ আসে শুধুমাত্র আমদানী শুল্ক থেকে। যদি আমরা স্মরণ রাখি যে, বিগত বছরের সময়কালে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় গড়ে অর্ধেকেরও বেশি মেটানো হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যর মাধ্যমে তাহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজস্ব বাজেটের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর চরিত্রটি অপরদিকে রাজস্ব বাজেটকে কোনোরকমে পৃথক করা গেলেও আমাদের উন্নয়ন বাজেট যে স্পষ্টতই বিদেশী সাহায্য নির্ভর বিভিন্ন বাজেট বিশ্লেষণ করলেই তা বুঝা যায়। কিন্তু আমাদের নির্ভরতার মাত্রাকে শুধু এই বাজেটের আকারে দেখলে এটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। কারণ বাংলাদেশ যেসব আকারে বৈদেশিক সাহায্য পেয়ে থাকে প্রকল্প সাহায্য তন্মধ্যে একটি, যদিও এটি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে । এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলোতেই প্রকল্প বহির্ভূত সাহায্য যেমন, খাদ্য সাহায্য, দ্রব্য সাহায্য ইত্যাদি প্রাপ্ত সমস্ত সাহায্যের শতকরা ৫১.৭৮ ভাগ থেকে ৫২.৫৭ ভাগ স্থান দখল করে আছে। (সারণি ৩ ও ৪ দ্রষ্টব্য)

সারণি - ৩

বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান

খাত	ঋণ	অনুদান	মোট	শতকরা
খাদ্য	৭৬.৩	৫০৬.৯	৫৮৩.২	১৬.৮
পণ্য	৫২১.৫	৪৮৭.৪	১০০৮.৯	২৯.০
প্রকল্প	১২০২.৫	৬৮১.১	১৮৮৩.৬	৫৪.২
মোট	১৮০০.৩	১৬৭৫.৪	৩৪৭৫.৭	১০০.০
শতকরা	৫১.৮	৪৮.২		

সূত্রঃ এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় (ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০০)।

নির্দেশিকাঃ ই আর ডি কর্তৃক প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারী ২৭,২০০০) তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত। হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি আই এম এফ ক্রেডিট ও কিছু বিশেষায়িত খাতের ধার/কর্জ, যার মধ্যে আছে খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, দেশরক্ষা বাহিনী, এনজিও ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত।

সারণি-৪

গত দশকে সাহায্য প্রাপ্তি (১৯৯০/৯১.....১৯৯৬/৯৭)

খাদ্য		সাহায্য	পণ্য	সাহায্য	প্রকল্প	সাহায্য	সর্বমোট	
অর্থবছর	প্রতিশ্রুতি	অবমুক্তি	প্রতিশ্রুতি	অবমুক্তি	প্রতিশ্রুতি	অবমুক্তি	প্রতিশ্রুতি	অবমুক্তি
১৯৯০-৯১	১৮৩.৮	২৬৮.৬	২৯৫.৯	৪০৮.১	৮৯০.৬	১০৫৫.৯	১৩৭০.৩	১৭৩২.৬
১৯৯১-৯২	২২৬.০	২৪১.২	৫৭৫.৭	৩৮৬.০	১১১৩.৯	১০৬৪.০	১৯১৫.৬	১৬৯১.২
১৯৯২-৯৩	১৭৭.৭	১২১.০	৩৩৬.১	৩৭২.১	৭৬০.৭	১১০১.৯	১২৭৪.৫	১৫৯৫.৬
১৯৯৩-৯৪	৮৩.৪	১১৭.৪	৩৬৫.৪	৪৫১.৩	১৯৬১.৪	৯৮৯.৫	২৪১০.২	১৫৫৮.৬
১৯৯৪-৯৫	১৩২.১	১৩৭.৪	৩৫৪.৩	৩৩২.৮	১১২৫.৮	১২৬৮.৯	১৬১২.২	১৭৩৯.১
১৯৯৫-৯৬	১৩২.৮	১৩৮.০	১৬৩.১	২২৯.৪	৯৮৩.৬	১০৭৬.৪	১২৭৯.৫	১৪৪৩.৮
১৯৯৬-৯৭	১৩৭.৯	১০০.৮	১৭০.৫	২৬৩.১	১৩৫২.৮	১১১১.৪	১৬৬১.১	১৪৭৫.৩

*সাহায্যের অংশ মিলিয়ন ডলারে,

সূত্রঃ ভোরের কাগজ, ৩১ অক্টোবর ১৯৯৭

বৈদেশিক সাহায্যের প্রকৃত সুবিধা ভোগী কারা?

বিদেশী সাহায্য আমাদের অর্থনীতিকে যে চাঙ্গা করতে পারেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯৭২-৭৫ সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার- এর দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বুঝা যায়। এ সময় সবচেয়ে কম ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে দেশের সব চাইতে সমস্যাসঙ্কুল সময়ে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ৭ ভাগ। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে দেশের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৫-৮০ বছরগুলোতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪.৭ ভাগ। এরপর ১৯৮০-৮৬ বছরগুলোতে তা আরো কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩.৬ ভাগ এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর গতি শতকরা ৫.৫ ভাগকে অতিক্রম করতে পারেনি। গত চৌত্রিশ বছরে আমরা উন্নয়নের জন্য বিদেশী বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়েছি

২৪ বিলিয়ন ডলার। ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্যে সেটা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। সুন্দর কথায় জড়ানো প্রকল্পের পেছনে এই অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্প চমৎকার যত সব ফলাফলের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। প্রকল্পের ফলাফল কি হয়েছে সেটা পরে আর শুনা না গেলেও প্রকল্প রচনাকারীরা তাদের মোটা ফি নিয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় তারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। এই সুবাধে আরো উচ্চতর ফি-তে নতুন প্রকল্প রচনার কাজ পেয়ে গেছেন। পরামর্শকরা তাদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য মূল্যবান প্রতিদান নিয়ে গেছেন। সরবরাহকারী চড়াদামে মালামাল, যন্ত্রপাতি সরবরাহ দিয়ে গেছেন, ঠিকাদার আরো দশজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলেছেন।[৯] বাংলাদেশের প্রবাদ পুরুষ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস এর মতে, ১৯৯২ সাল পযর্ন্ত প্রাপ্ত ২৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের ৭৫ শতাংশ এই দেশে ব্যয়িত হয়নি। এই অর্থ মালামালে, মূল্য ও পরামর্শক, বিশেষজ্ঞদের বেতন ভাতা বাবদ দাতা দেশগুলোতে ফিরে গেছে। যে ২৫ শতাংশ এদেশে ব্যয়িত হয়েছে তার মোট অংশ গেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ঘুষ প্রদান বাবদ। বাকী অংশ পেয়েছেন দেশীয় পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, ঠিকাদার ও ইনডেনটাররা । এদেশের প্রকল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও ব্যয় হয়েছে এই টাকার যতকিঞ্চিত পরিমাণ।[১০] অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহানের মতে, এদেশে ১০০ ডলার আসলে যন্ত্রপাতি কিনতে লাগে ৭৯ ডলার বিদেশে বিশেষজ্ঞ (Consultant) নিয়োগে ১০ ডলার, দালালরা পায় ৩ ডলার এবং স্থানীয় (আমলারা) পায় ১ ডলার, এসব কিছু মিলিয়ে ৯৩ ডলার পায় এবং ৭ ডলার পায় জনগণ।[১১]

প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৬৬ ভাগ সরাসরি খাদ্য সাহায্য এবং পণ্য কেনার জন্যে ব্যয় হয় যা কঠোর শর্তযুক্ততার কারণে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন অবদান রাখতে পারছে না। অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ ঋণের মধ্যে প্রকল্প ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ চলে যায় সাহায্যদাতা দেশসমূহের চাহিদা মেটাতে। এছাড়া যে কোনো প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ, মূল্যায়ন ইত্যাদির বাবদ বিদেশী সাহায্যদাতারা মোট প্রকল্প খরচের শতকরা ১৫ ভাগ প্রকল্প স্থাপনের পূর্বেই নিয়ে যায়।[১২]

বৈদেশিক সাহায্যের বদৌলতে আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণী যারা মূলত এই সাহায্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে সুফল ভোগ করছে। আর এই সুবিধাভোগীদের অধিক বিত্ত-বৈভব সমাজে সৃষ্টি করছে এক নতুন মেরুকরণের। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে গগনচুম্বী। সুবিধাভোগীদের একটি অংশ হলো বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানীকারকগণ। এরা স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি আমদানী করে উচ্চহারে কমিশন গ্রহণ করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মুনাফা করে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর একটি বড় অংশ হলো নির্মাণ কাজ। এক্ষেত্রে ঠিকাদাররা গড়ে ২০ থেকে ৩০ ভাগের মতো মুনাফা নিয়ে থাকে। একইভাবে দেশীয় আমলাশ্রেণী বিভিন্নধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রকল্প থেকে এক বিরাট অংশ নিয়ে থাকেন । এর বাইরে রয়েছে দেশী- বিদেশী উপদেষ্টা শ্রেণী। সাহায্য প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি, বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরী বিষয়ে পরামর্শদান ইত্যাদির নামে প্রকল্প সাহায্যের একটি ভাগ তারা পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ সমাচার

পশ্চিমী সাহায্যদাতাদের পাঠানো বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ খলীকুজ্জামান আহম্মদ বলেছেন, 'তারা আমাদের শিল্পকারখানা এবং দেশের বাস্তবতা সম্পর্কে সামান্যই জানেন। তাদের সুপারিশ উপর ভাসা ও মেকানিক্যাল। আমি তাদের প্রণীত কয়েকটি রিপোর্ট দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে, এই সব রিপোর্ট কাজে আসবে না এবং অর্থ জলে ঢালা হয়েছে। এই সব বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা আরও ক্ষতিকর। কারণ তাদেরকে সকল তথ্য সরবরাহ করতে হয় । আমি মনে করি স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ বিদেশীদের চেয়ে ভাল কাজ করতে পারেন'।[১৩]

আর অপর দিকে অর্ধশিক্ষিত লোকদেরকে যারা সেসব দেশের অর্থনীতিতে বোঝাস্বরূপ এদের অনেককে এসব দেশে কনসালটেন্ট বা উপদেষ্টা করে পাঠানো হয়। এদের বেতন ভাতাও এত বেশি দেয়া হয় যে, তার কয়েকগুণ কম বেতন দিয়ে দেশীয় অনেক বেশি যোগ্য পরামর্শক পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু তারা সাহায্য দিয়ে থাকে, সেজন্য তাদের আর্থিক সাহায্যের সাথে সাথে কারিগরি সাহায্যের নামে (Technical Assistance) কতগুলো অদক্ষ বা আধাদক্ষ লোকদেরকে তৃতীয় বিশ্বে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ই, আর, ডি, (Economic Relations Division) এ বিষয়ে এদেশে বিদেশী পরামর্শকদের যোগ্যতাসহ ব্যবহারের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে যাতে দেখা যায় যে, এদের অনেকেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিল মাত্র। এ ধরনের দু- একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে অধীন একজন পাট বিশেষজ্ঞ (Jute Expert) হয়ে এসেছিলেন যিনি জীবনে কখনো পাট গাছ দেখেননি। তেমনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনসংখ্যা বিষয়ে পরামর্শক হয়ে এসেছেন যিনি জনবিজ্ঞান (Demography) কি কিংবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সে বিষয়টি পর্যন্ত জানেন না । অথচ এ ধরনের লোককে এদেশে মাসিক ৬-৮ হাজার ডলার পর্যন্ত বেতন দিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে।[১৪] সাহায্য নির্ভর প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ হচ্ছে দাতা দেশ গুলো থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ । বাংলাদেশ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে জুন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ২৪০ টি প্রকল্পে মোট ১৩৯০ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ২০টি ক্ষেত্রে বহিরাগত উপদেষ্টারা প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ ও তথ্যানুসন্ধানমূলক সমীক্ষায় নিয়োজিত থাকেন, শতকরা ২৪টি ক্ষেত্রে জড়িত থাকেন সমীক্ষা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এর কাজে, শতকরা ৭ টি ক্ষেত্রে তারা প্রকল্পের নির্মাণ ও যন্ত্রাদি স্থাপন কাজে শতকরা ৩১টি ক্ষেত্রে তারা কারিগরি জ্ঞান বা নৈপুণ্য স্থানান্তর করনের ভূমিকা পালন করেন এবং ১৮ শতাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌখিক পরামর্শ দানের মধ্যে তাদের কাজ সীমিত রাখেন।[১৫] তাদের অনেকেরই জ্ঞান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। বাংলাদেশ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট পরিচালিত এক সমীক্ষা হতে জানা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী ১৭ বছরে ৩০০টি প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করে বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় ৩ হাজারেরও বেশি। অথচ এদের অনেকেরই বিশেষজ্ঞ হবার মত ন্যূনতম জ্ঞানও নেই। এদের জন প্রতি মাসিক বেতন ভাতা দেয়া হয়েছে ৯৫ হাজার টাকা থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত উপদেষ্টাদের পিছনে খরচ হয় ১৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদেশী উপদেষ্টাদের পেছনে খরচ হয় ১২৪ কোটি টাকা বা ৯৩ শতাংশ। অবশিষ্ট ৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা ব্যয় হয় স্থানীয় উপদেষ্টাদের জন্য। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কর্মরত ১১৩৬ জন বিদেশী উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে একটি সংস্থা দেখেছে এদের মধ্যে মাত্র ৯১৪ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে ১৮ জন ছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বিহীন, ৩৭ জন ছিল হাইস্কুল পাশ, ৫০ জন ছিল জুনিয়র কলেজ লেভেলের, ২৫৭ জন গ্রাজুয়েট, পোষ্টগ্রাজুয়েট ৩৮০ জন, ১৪৬ জন পি এইচ ডি এবং মেডিসিন বিষয়ের ডিগ্রীধারী। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন এবং তারা যে ধরনের উপদেশ বিতরণ করুক না কেন তাদের জন্য কিন্তু আমাদের উচ্চহারে বেতন ভাতা দিতে হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য

২০০১-০২ অর্থ বছরের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ঘাড়ে বৈদেশিক দেনা ছিল মোট ১ হাজার ৬শ' ২৭ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলারের সমান অংকের অর্থ। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশী মুদ্রায় ওই দেনা হয় মোট ৯৪ হাজার ২শ' ৩৮ কোটি ৪লাখ টাকা। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭ হাজার ৪শ' ৩০ কোটি টাকা পেয়েছে। তার ভেতর থেকে বাংলাদেশ ২ হাজার ৮শ' ৯০ কোটি টাকা শোধ করে দেনার কিস্তি ও সুদ বাবদ। সে হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশের ঘাড়ে বিদেশী দেনা ৯৮ হাজার ৭শ' ৭৮ কোটি ৪লাখ টাকা। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তের কোটি। তাতে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মাথাপিছু দেনা হয় ৭ হাজার ৩শ' ১৭ টাকা।[১৬] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আমলে সুদসহ সরকারের বৈদেশিক দেনার স্থিতি ছিল সাত শত ত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ঋণ আনা হয় চারহাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ কোটি টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয় সাত শত কোটি সাতষট্টি লক্ষ টাকা। ১৯৮১ সালে বৈদেশিক দেনার স্থিতি ছিল পাঁচ হাজার সাত শত দশ কোটি একান্ন লক্ষ টাকা। এরশাদ সরকারের আমলে সুদসহ নতুন ঋণ গ্রহণ করা হয় ২৬ হাজার ৫ শত ৮১ কোটি টাকা। তার আমলে সুদসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে পাঁচ হাজার তিন শত চুয়াত্তর কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। খালেদা জিয়া সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল বত্রিশ হাজার দুই শত একানব্বই কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। বি এন পি সরকার নতুন করে সুদসহ ঋণ গ্রহণ করে উনত্রিশ হাজার ছয় শত ছয়চল্লিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা। তার সরকার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে নয় হাজার দুই শত একাশি কোটি তেইশ লক্ষ টাকা। ১৯৯৬ সালে দেশে পুঞ্জিভূত বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল একষট্টি হাজার নয়শত আটত্রিশ কোটি টাকা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৯৯৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে ছয় হাজার নয় শত নিরানব্বই কোটি টাকা।[১৭] (সারণি –৫) বর্তমান সরকারের ২০০৩–০৪ বাজেটটিও এ দুষ্টচক্র হতে বের হতে পারে নি। (সারণি– ৬) ২০০৪–২০০৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) জন্য ২০,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে । যা ২০০৩–২০০৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৩ হাজার ২শ' কোটি টাকা বেশি । এবার এডিপি বাস্তবায়নে ১০,৩০১ কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের ৫১%) বিদেশী সম্পদ এবং ৯,৯৯৯ কোটি টাকা দেশীয় সম্পদ (৪৯%) যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১০,৩০৪ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্যের ৮,৪৮৪ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য, ১,৪৬০ কোটি টাকা বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা/ঋণ, ১৮৩ কোটি টাকা পণ্য সাহায্য, ৮৭ কোটি টাকা খাদ্য হিসাব থেকে স্থানান্তর এবং ৮৭ কোটি টাকা অন্যান্য খাত থেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯,৯৯৯ কোটি টাকার মধ্যে নীট দেশীয় সম্পদ থেকে আসবে ৭,৩৯৬ কোটি টাকা আর বাকী ২,৬০৩ কোটি টাকা ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে।

(সারণি-৫)

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকারের আমলে বৈদেশিক দেনা

আমল	বৈদেশিক দেনার স্থিতি (কোটি টাকা)	নতুন ঋণ গ্রহণ সুদসহ (কোটি টাকা)	পরিশোধ (কোটি টাকা)
শেখমুজিব	৭৩০৩৯	৭৩০১২	৭৭.৩০
জিয়া	৫৭১০.৫১	৪৫৪৪.১৪	৭০০.৬৭
এরশাদ	৩২২৯১.২২	২৬৫৮১.০০	৫৩৭৪.২৬
খালেদা	৬১৯৩৭.৯৫	২৯৬৪৪৬.৭৩	৯২৮১.২৩
হাসিনা (জানুয়ারী)	৬৭৮১৫.৯২	৬৯৯৯.০০	৪২৫২.০০

সূত্রঃ যায়যায়দিন, প্রতিদিন, রবিবার, ২১ শে মার্চ ১৯৯৯

(সারণি – ৬)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
	২০০৩ – ০৪	২০০২ – ০৩	২০০২ – ০৩
সংযুক্ত তহবিল – রাজস্ব প্রাপ্তি			
কর রাজস্ব	২৯০৭১	২৪৯৫০	২৫৫০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৭১০০	৬১৭০	৭৫৮৪
উপমোটঃ		৩৬১৭১	৩১১২০	৩৩০৮৪
সংযুক্ত তহবিল – ব্যয়				
অনুন্নয়ন রাজস্ব		২৮৯৬৯	২৫৩০৭	২৩৯৭২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		২০৩০০	১৭১০০	১৯২০০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত প্রকল্প		৩৯০	৩৯০	৩৭১
মূলধন ব্যয়		২১৫৫	১৪৫৯	৯৭৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ ও অগ্রিম (নীট)		–৮৭৫	-১০২৯	-৫৬৪
খাদ্য হিসাব		৫১৯	– ৭৬	২৩৪
কাবিখাসহ এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়		৫২২	৭৫৩	৬৬৩
উপমোট ঃ		৫১৯৮০	৪৩৯০৪	৪৪৮৫৪
সামগ্রিক ঘাটতি		১৫৮০৯	১২৭৮৪	১১৭৭০
অর্থ সংস্থান				
বৈদেশিক সম্পদ				
বৈদেশিক অনুদান		২৫৯৬	২৪৪৭	৩০৪১
বৈদেশিক ঋন		৯৮০৫	৭৪৩৪	৬১৩৯
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ		৩০৯২	– ২৮৯১	– ৩০০৭
মোট বৈদেশিক সম্পদ		৯৩০৯	৬৯৯০	৬১৭৩
আভ্যন্তরীণ সম্পদ				
মেয়াদী ঋণ		২৩৭	৯৩	৩৯
অতিরিক্ত বাজেটরী সম্পদ/নিজস্ব অর্থায়ন		০	২০০	২০০
টি এ্যান্ড টি বন্ড		২০০	২০০	২০০
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব স্থানান্তর (নিট)		৩৪৬০	৩৮০০	৩৮০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ		৩৮৯৭	৪২৯৩	৪২৩৯
ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ		২৬০৩	১৫০১	১৩৫৮
মোট অর্থায়ন		১৫৮০৯	১২৭৮৪	১১৭৭০

শৃঙ্খলিত অর্থনীতি: মুক্তির উপায় কি ?

জাতীয় সম্পদের পূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজের বঞ্চিতদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনই অবহেলিতদের জন্য অধিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। মোটকথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা চেতনার পরিপোষণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ত অনুভূত হবে বহুদিন, কিন্তু নিজেদের সৃষ্টিশীল উদ্যমের কণ্ঠরোধ না করে এবং তার অপচয় না ঘটিয়ে যেন তার আগমন ঘটে তা দেখতে হবে। সর্বোপরি দেখতে হবে, প্রাপ্ত সাহায্যের পূর্ণ বিনিয়োগ সম্পন্ন হচ্ছে। কেননা দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থবাজারে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, যা প্রকারান্তরে কর্মের পরিধি বাড়ায় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি করে, অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয় এবং দেশ ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। ঋণ নয়, বিনিয়োগ বিশেষত আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগই অর্থনীতিতে সত্যিকার গতিশীলতা আনয়ন করে । কিন্তু বিএনপি সরকারের আমলে বিদেশী বিনিয়োগের চিত্রটা দেখে দেশবাসী হতাশ হবে। গত দুই অর্থবছরে বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে।

(সারণি – ৭)

১৯৯৬ – ৯৭ থেকে ২০০২ – ২০০৩ পর্যন্ত তথ্য নিচে দেওয়া হলো

১৯৯৬ – ৯৭	১, ০৫৪ মিলিয়ন ডলার
১৯৯৭ – ৯৮	৩,৪৪০ মিলিয়ন ডলার
১৯৯৮ – ৯৯	১,৯২৬ মিলিয়ন ডলার
১৯৯৯ – ০০	২,১১৯ মিলিয়ন ডলার
২০০০ – ০১	১,২৭১ মিলিয়ন ডলার
২০০১ – ০২	৩০৪ মিলিয়ন ডলার
২০০২ – ২০০৩	২১২ মিলিয়ন ডলার

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, পৃষ্ঠা ৭০, ২০০৩

শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোন সমাজ অগ্রগতি সাধন করেনি ইতিহাস তার সাক্ষী। উত্তরোত্তর ঋণভারে জর্জরিত দেশকে স্বাবলম্বী পর্যায়ে আনতে হলে নির্বিচারে ঋণ গ্রহণ বন্ধসহ প্রাপ্ত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং অবাধ আমাদানী নিষিদ্ধ করতে হবে এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ঋণদাতা সংস্থা/দেশসমূহ তাদের পণ্যের উন্মুক্ত বাজার চালু এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ে রাখার জন্যই মূলত ঋণের অবারিত ভাণ্ডার দরিদ্র দেশসমূহের দিকে প্রসারিত করে থাকে।

নির্ভরশীলতার ধারাবাহিক পটভূমিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো নিজস্বতা নেই, নেই কোন স্বকীয়তা বরং ক্রমশ সে হয়ে পড়ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ । স্বাধীনতা প্রাপ্তির চৌত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে দেশ। অথচ স্বাধীনতার পরিপূরক স্বাবলম্বিতার সোনার হরিণ এখনো রয়ে গেছে আমাদের ধরা ছোয়ার বাইরে। আমরা অনেক নেতা পেয়েছি । সেই সাথে পেয়েছি অনেক রাজনৈতিক দর্শন। এসব নেতাদের বক্তব্য আর রাজনৈতিক দর্শনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ

মানুষের জন্য কল্যাণকর সুষম একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হলেও প্রকৃত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির নষ্ট রাজনীতি যে বিষবৃক্ষ জন্ম দেয় তার অবধারিত পরিণাম হিসাবে এদেশের কোটিপতি পরিবার তের থেকে শতক, হাজারের ঘর অতিক্রম করেছে খুবই দ্রুত। অন্যদিকে ললাটে বঞ্চনার পদচিহ্ন আঁকা দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও অযুত, লক্ষ, কোটির ঘর ছাড়িয়ে বাড়ছে ক্রমাগত। দুঃসহ এ অবস্থা থেকে আমরা সবাই মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু পথ কোথায়?

উপসংহার

স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল অর্থনীতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শর্তযুক্ত বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান সম্পূর্ণরূপে বর্জন। কিন্তু বাস্তবতা? বাস্তবতা হচ্ছে 'মানি ইজ নো প্রোবলেম' এর খাতক সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে উন্নয়নের নামে ৩৪ বছরে বিদেশীদের কাছ থেকে আমরা অমর্যদাকর ভিক্ষা বা সাহায্য গ্রহণ করেছি এক লাখ কোটি টাকা। আমাদের মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ আজ ১২০ ডলার । এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ সাহায্য প্রবাহিত করা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অন্তত আনুষ্ঠানিক ভাবে সেটাই বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ইতোমধ্যে কিছু মূল্যবান গবেষণা করেছেন, যা ১৯৮০'র দশকে ও ৯০ এর দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক সময়ে ডঃ আতিউর রহমান, ডঃ তাজুল ইসলাম, সৈয়দ এম হাশেমী বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। বৈদেশিক ঋণ সাহায্য প্রবাহ যে বাংলাদেশের সামগ্রিক মানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে এমনটি এখনও পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন গবেষণার প্রমাণিত হয়নি। বরং বৈদেশিক সাহায্য এ দেশে জন্ম দিয়েছে ব্যাপক পরনির্ভরশীলতার সংস্কৃতি, ধ্বংস করেছে আমাদের আত্মবিশ্বাস। এই নির্ভরতার কারণে নীতি নির্ধারণ থেকে কর্মসূচির প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সকল ক্ষেত্রে দাতাদের খবরদারীর নজির বিদ্যমান।

উন্নয়নের শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটানোর জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, প্রয়োজন আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-গরিমার। বৈদেশিক সাহায্য এগুলোকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা একটি জাতির আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে, আত্মগরিমা এবং রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত স্বাধীনতাকে হরণ করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থবহ হতে পারে না । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে হলে আমাদের সমুদয় মেধা, মনন ও শ্রমকে কাজে লাগাতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত আত্মনির্ভর উন্নয়ন কৌশল - যেখানে জাতির সব সদস্যের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ফল ভোগের অধিকারও নিশ্চিত হবে। শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে তাদের মেধার বিকাশ ঘটে এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত অবদান রাখতে পারেন আর তা থেকে ন্যায্য সুফল ভোগ করতে পারেন।

তথ্যসূত্র

১. Ministry of Finance Govt. Of Bangladesh Economic Survey. 1984 – 85, Dhaka.

২. ভট্টাচার্য দেবপ্রিয়, জাতীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আন্তজার্তিক সম্পর্ক, পৃষ্টা ১৬৩, বি আই ডি এস, ঢাকা।

৩. মোস্তফা হাসান ও মোঃ আবুল হোসেন, ১৯৯৯, পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রনয়ন, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৪. আহমদ কাজী খলীকুজ্জমান, বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য কি মূল্যে? উন্নয়ন বিতর্ক, পঞ্চম বর্ষ, মার্চ - ডিসেম্বর ১৯৮৬, ঢাকা।

৫. আহমদ কাজী খলীকুজ্জমান, বাংলাদেশ আর্থ - সামাজিক বিকাশঃ পথের সন্ধানে, পৃষ্টা ৮৭, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা।

৬. Rehman Sobhan (1982), The Crisis Of External Dependence, University Press Limited, Dhaka.

৭. চৌধুরী হাসানুজ্জমান (১৯৯৩), সমাজ ও উন্নয়ন, পৃষ্টা ৭১- ৭২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য হচ্ছে প্রতিটন ২২০ মার্কিন ডলার আর গম প্রতি টন ১৫০ ডলার। ১৯৮৪ সালে এই মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৫০ ও ১৫০ মার্কিন ডলার?

৯. সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ২রা নভেম্বর ১৯৯৪, ঢাকা।

১০. Sobhan R. and Islam T. (1999), Foregin aid and domestic resour ces mobilization in Bangladesh. BIDS, Vol xvi.

১১. মোঃ আবুল হোসেন ও মোকাম্মেল হোসেন (১৯৯৯), উন্নয়ন প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১২. ইউনুস ডঃ মুহাম্মদ (১৯৯৪), পথের বাধা সরিয়ে নেন, মানুষকে এগুতে দিন, পৃষ্ঠা ১৫-১৬ সুবর্ণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।

১৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির জার্নাল (১৯৭৭), সংখ্যা ১, খন্ড ৩।

১৪. আলম খুরশিদ (১৯৮১), উন্নয়নমূলক সমাজবিজ্ঞান, মিরনাভা প্রেস, ঢাকা, ডিসেম্বর।

১৫. Bangladesh Project Management Institute, Utilization Of Expatriate Consultancies IN Bangladesh, Vol- 1, Main Report Page 65.

১৬. দৈনিক সংবাদ, ২০ জুন, ২০০৩।

১৭. যায় যায় দিন, প্রতিদিন, রবিবার ২১ শে মার্চ ১৯৯৯।